ভূমিকা

বৃক্ষ যেমন তার শিকড় দ্বারা মাটি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, তেমনি কোনো জাতিও তার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার রসদ খুঁজে পেতে চায়। এই অতীতরূপী শিকড়ের অনুসন্ধানে স্রষ্টারা বিভিন্ন সময়ে মনোনিবেশ করেছেন। অতীত ঐতিহ্যের সন্ধান দুই প্রকার হতে পারে— প্রথমত, যা একসময় ছিল কিন্তু আজ নেই, তার সন্ধান। দ্বিতীয়ত, একদিন যা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, তার অনুসন্ধান। প্রথম ধারাটি ইতিহাসের অনুসন্ধান আর দ্বিতীয় ধারা হল মিথ-পুরাণের অনুসন্ধান। পুরাণকথাকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার মধ্যে ধর্মপ্রতীতিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই দেববাদ পরিণত হয়েছে মানবতাবাদে। উনিশ শতক থেকে ধর্মানুগত্যকে দূরে সরিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবোধ দ্বারা মানবতাবাদের আলোকে পৌরাণিক আখ্যানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আধুনিক সৃজনকারেরা এই ঐতিহ্যের খনি মিথ-পুরাণের বারবার আশ্রয় নিয়েছেন, তা কখনো ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে, আবার কখনো প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে কিংবা সমকালীন সমাজ সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করতে।

বাংলা সাহিত্যে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি প্রকরণে স্রষ্টারা পুরাণের ঘটনা ও চরিত্রকে বিষয়বস্তু হিসাবে চয়ন করলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার প্রচলন অনেকটাই পরবর্তীকালে। সার্থক বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনার প্রায় ১০৩ বছর পর প্রথম পুরাণকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস বারীন্দ্রনাথ দাশের 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব' (১৯৬৮) রচিত হয়। এই দীর্ঘ ১০৩ বছরে বাংলা উপন্যাসে ইতিহাস, সমাজ জীবন, আঞ্চলিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন বিষয় হিসাবে উঠে এলেও এই প্রথম পুরাণ উপন্যাসের অবয়বে বাঁধা পড়লো। বারীন্দ্রনাথ দাশ প্রদর্শিত পথেই রচিত হয়েছে প্রমথনাথ বিশীর 'পূর্ণাবতার' (১৯৭২), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দময়ন্তী' (১৯৭১), 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৭৬), 'শকুন্তলা' (১৯৮০), 'কর্ণ', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' (১৯৭৭), 'চির সীমন্তিনী' (১৯৮১), কালকূটের (সমরেশ বসু) 'শাম্ব' (১৯৭৮), 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮৪), 'প্রাচেতস' (১৯৮৪), 'পৃথা' (১৯৮৬), 'অন্তিম প্রণয়' (১৯৮৭), চিত্ত সিংহের 'জতুগৃহ' (১৯৭৬)-এর মতো উপন্যাস। পুরাণের অলৌকিকতা ও ভক্তিবাদকে অতিক্রম করে ঔপন্যাসিকেরা পুরাণকথার অন্দরে জীবন ও তার বহুমাত্রিক ভাবনাকে সন্ধানে নিমগ্ন হয়েছেন। তাঁরা অব্যক্ত তথা প্রচ্ছন্ন, অনালোচিত ক্ষেত্রের ওপর আলো ফেলেছেন।

পৌরাণিক আখ্যানকে বিষয়বস্তু করেই বাংলা উপন্যাস জগতে প্রবেশ করেন দীপক চন্দ্র। প্রথম উপন্যাস 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৭৯) থেকে শুরু করে প্রায় চল্লিশটির অধিক উপন্যাসে

তিনি পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। পুরাণকথাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে ধারাবাহিক উদ্যোগে উপন্যাস রচনা করেছেন। পুরাণের মধ্যে দিয়েই জাতির অস্তিত্বের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারা ও সেই ধারায় দীপক চন্দ্রের কৃতিত্ব আলোচনাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় : **মিথ ও পুরাণের সীমানা ও স্বরূপ**
দ্বিতীয় অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের জীবনকথা ও সাহিত্যপরিচয়**
তৃতীয় অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় বিন্যাস**
চতুর্থ অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে মিথ-পুরাণের পুনর্নির্মাণ**
পঞ্চম অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে চরিত্রনির্মাণ**
ষষ্ঠ অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**
সপ্তম অধ্যায় : **দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসে ভাষানির্মাণ**
উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়ে মিথ ও পুরাণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাহিত্যে মিথ-পুরাণের ব্যবহারের তাৎপর্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে পুরাণের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত উপন্যাসে পুরাণের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দীপক চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দীপক চন্দ্রের উপন্যাসকে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরপর চতুর্থ অধ্যায়ে উপন্যাসে কীভাবে পুরাণ পুনর্নির্মিত হয়েছে তথা আধুনিকতা লাভ করেছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পৌরাণিক চরিত্রগুলি কীভাবে তাঁর উপন্যাসে যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী ও আধুনিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠেছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৌরাণিক রাজনীতির আবরণে কীভাবে দীপক চন্দ্র বর্তমানকালের রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে উপন্যাসে কীভাবে পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহার অংশে দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই ধারায় তাঁর কৃতিত্ব ও খামতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।